তারিখ 15 OCT 2016

সমকাল

কওমি মাদ্রাসা ও নেতিবাচক রাজনীতি

সমকালীন প্রসঙ্গ | মোস্তফা হোসেইন

শিশুসাহিত্যিক ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ের গবেষক

বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসা কতটা ধর্মীয় শিক্ষায়তন, কতটা রাজনৈতিক হাতিয়ার? প্রশ্নটা এই মুহূর্তে আসতেই পারে। কওমি মাদ্রাসাগুলোর পরিচালনা, তাদের শিক্ষাক্রম, তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম, সরকার বিরোধিতার ধরন– সবই এ প্রশ্নের জন্ম দেয়। সরকার সম্প্রতি কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়ার পর কওমি মাদ্রাসাগুলোর বৃহত্তম নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের (বেফাক) পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা করা হয়। তারা বলেছে, কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো পদক্ষেপ নিতে গেলে সরকারকে চরম মূল্য দিতে হবে। সরকার কওমি মাদ্রাসাগুলো নিয়ে যা ভাবছে তা রীতিমতো আগুন নিয়ে খেলা।

বেফাকের পরিচালনা পরিষদ মজলিশে আমেলার সভাপতি হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ আহমদ শফী। এই হেফাজত সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে? বছর কয় আগে ঢাকায় ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে কী নারকীয় ঘটনার জন্ম দিয়েছিল হেফাজত, তা বোধ হয় কারও ভুলে যাওয়ার কথা নয়। যার দ্বারা কওমি মাদ্রাসার শিক্ষা বোর্ড বেফাক পরিচালিত সেই বেফাকের অনেকেই বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের শরিক দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফত মজলিশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশের শীর্ষস্থানীয় নেতা। অথচ বেফাকের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলীয় শীর্ষ নেতারা বেফাকের আমেলার সদস্য হওয়ার যোগ্য নন। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন আসে, যারা নিজেরাই বেফাকের গঠনতন্ত্র উপেক্ষা করে তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় আইন-সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা কতটা বাস্তবসম্মত।

২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের নাটকীয়তায় খালেদা জিয়া ও বিএনপির সরাসরি সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমেও বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে– এই কওমি মাদ্রাসাগুলোর অবস্থান কী? প্রশ্ন হচ্ছে– বেফাক যদি সত্যিই মাদ্রাসা শিক্ষার একটি বোর্ড হয়ে থাকে, তাহলে তারা সরকারকে প্রতিপক্ষ কিংবা শত্রু ভাবতে পারে কীভাবে? এতেই স্পষ্ট প্রমাণ হয়, তারা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে সামনে এনে কাজ করছে। আর সেই জন্য যে পদক্ষেপগুলো নেবে সবই হবে মূলত রাজনৈতিক কারণে এবং সরকারের প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে।

এমন পরিস্থিতিতে সরকার যখন '২০১৩ সালে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ আইন-২০১৩' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে, তাতে বাধা প্রদান করে তারা। তখনও তারা মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদসহ কয়েকজনকে 'সরকারের দালাল' বলে আখ্যায়িত করে স্পষ্টত সরকারকে প্রতিপক্ষ বানিয়েছে। এখনও সেই অবস্থানেই তারা রয়েছে।

ব্যাপক সমালোচনা সামাল দেওয়ার লক্ষ্যে কিছু মাদ্রাসায় ধর্মীয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি এখন সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ানোর বিষয়ও জানা যায়। কিন্তু সেগুলো স্পষ্টত বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে উপেক্ষা করে রচিত। বেফাকের নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষাক্রমেও তার প্রমাণ আছে। একটি উদাহরণ মাধ্যমে বোঝা যায়, এই প্রতিষ্ঠানটি কীভাবে বাংলাদেশের জন্ম ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে পরিচিত করার চেষ্টায় লিপ্ত। পঞ্চম শ্রেণির ইতিহাসে পাকিস্তান সৃষ্টি অংশে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের ভূমিকাকে বড় করে দেখানো হয়েছে। সেখানে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিংবা মুসলিম লীগ যে নিয়ামক ছিল তা বেমালুম চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম প্রসঙ্গে তারা জামায়াতে ইসলামী ও পাকিস্তানপন্থি কিছু গোষ্ঠীর পথকেই অনুসরণ করেছে। তারা বলেছে, '১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং সেই পথ ধরেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় প্রকৃতপক্ষে সংগ্রামরত হক্কানি উলামায়ে কিরামেরই অবদান।'

যদি তারা ভ্রান্ত রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত না হতো, তাহলে এভাবে মিথ্যাচারে লিপ্ত হতে পারত কি? বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এমনকি পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষকারী মানুষ এখনও জীবিত আছেন অনেকেই। বইয়ের ভাষ্য ও দালিলিক প্রমাণের কথা না হয় না-ই বলা হলো। সাক্ষী হিসেবে সেসব মানুষকেও যদি জিজ্ঞেস করা হয় তারা কি বেফাক প্রবর্তিত ইতিহাসকে সত্য বলে মেনে নেবেন? এ দেশের মানুষ জানে উলামায়ে কিরামের নগণ্যসংখ্যক আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। বরং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে বড় একটি অংশ। এই একটি অংশের মাধ্যমেই প্রমাণ হয় তারা প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশের সার্বভৌম বিরোধী রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই কাজ করছে।

এই গ্রন্থেই উল্লেখ আছে– একাত্তরে পাকিস্তান বিভক্ত হয়েছে। এটাকে ইতিহাসের সঙ্গে ধৃষ্টতা বলে আমরা সহজেই আখ্যায়িত করতে পারি। বলতে পারি, তারা আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের মহান নায়কদের বিষয়টি স্পষ্টতই এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেই গ্রন্থে।

নিবন্ধের প্রথম অংশে কওমি মাদ্রাসা পরিচালকদের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বক্তব্য যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রসূত তা বলা হয়েছে, এবার কওমি মাদ্রাসার রাজনৈতিক ইতিহাসের অতি সামান্য আলোচনা করা যেতে পারে। আমরা অনায়াসেই বলতে পারি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভি (১৭০৩-১৭৬২) থেকে শুরু করে একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাহমুদ আল হাসান এমনকি পরবর্তীকালেও রাজনৈতিক ধারাকে ধর্মীয় শিক্ষার সাথি হিসেবে রাখা হয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, মাহমুদ আল হাসান ও অন্যরা যে চেষ্টা করেছিলেন সেখানে দেশাত্মবোধ ছিল। ছিল ইংরেজ খেদাওর মতো রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থন। যার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনকেও তুলনা করা যেতে পারে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে মাহমুদ আল হাসান মদিনায় প্রবাসী সরকার গঠন করেছিলেন। যেখানে 'শায়েখ আল হিন্দ' খ্যাত হাসান আমির, বরকতউল্লাহ ভূপালি ছিলেন মন্ত্রী এবং মহারাজা প্রতাপ সিংকে এর প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল। এগুলো কওমি মাদ্রাসার জন্মস্থলের পার্শ্ব কার্যক্রম ও এখানে প্রযোজ্য অংশমাত্র। উল্লেখ করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজকে কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক যে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে, সেটা শাহ আহমদ শফী উদ্ভাবিত নয়।

যদিও বলা হয়, তারা মোল্লা নিজামউদ্দিন সাহালভি প্রবর্তিত কারিকুলাম 'দরসে নিজামিয়া নেসাব' অনুসারে তাদের কারিকুলাম পরিচালনা করে থাকে। কার্যত তারা সেই থেকে দূরে অবস্থান করছে। দেওবন্দের আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারার খণ্ডিত অংশকে তারা ধারণ করেছে। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে তাদের ইতিবাচক ভূমিকাকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু হালে তারা যে রাজনৈতিক পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাকে ইতিবাচক বলার কোনো সুযোগ নেই। একইভাবে দরসে নিজামিয়া নেসাবকেও খণ্ডিত করেই সুবিধামতো অবস্থান তৈরি করেছে, যা বাংলাদেশের ইতিহাস, সংস্কৃতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। যে কারণে তাদের শিক্ষার্থীদের বলতে শোনা যায়, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া না-জায়েজ। জাতীয় পতাকাও দরকার নেই। তাদের এসব বক্তব্য স্পষ্টতই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার মাধ্যমে পাকিস্তানি ভাবধারা প্রতিষ্ঠার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা এবং সেটা করা হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক শক্তির কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে।

সুতরাং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার করার বিষয়টিও গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। আজকে সংবিধানের নির্দেশনা অনুযায়ী একক ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সেটি অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে। ২০১৩ সালের ৫ মে যে তাণ্ডব তারা ঘটিয়েছে সেখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব রাজনৈতিক শক্তিকে একটি প্রশ্নে হলেও একাত্ম হতে হবে, অন্তত দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় করার প্রয়োজনে।